শিশু পরিচর্যা

ডাঃ মনজুর হোসেন

Goto List >

শিশু পরিচর্যা

ডাঃ মনজুর হোসেন
এম বি বি এস (ঢাকা) ডি টি এম এণ্ড এইচ (ব্যাঙ্কক)
ডি সি এইচ (গ্ল্যাসগো) এম আর সি পি (ইউ কে)
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ
ঢাকা শিশু হাসপাতাল

Goto List >

CARE OF INFANT AND YOUNG CHILDREN
a guide book
By Dr. MANZOOR HUSSAIN

স্বত্ব ঃ ডা ঃ মনজুর হোসেন

রচনাকাল ঃ ১৯৮৭–৮৯

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

প্রকাশিকা ঃ
মিসেস শারমিন মনজুর
১৬৬ গ্রীনরোড (দোতলা)
ঢাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ ডাঃ জাফর উল্লাহ্ সিকদার

মুদ্রণে ঃ
বিকাশ মুদ্রণ
৩/১, গার্ডেন রোড
ঢাকা

মূল্য ঃ ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Goto List >

ভূমিকা

জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পর্যায়ক্রমিক গতি সম্বন্ধে অনেক মায়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় এই পুস্তিকা লেখার প্রয়োজন অনুভব করি। তাই এই পুস্তিকায় সহজভাবে শিশু লালন পালনে যে সমস্ত বিষয় মায়েদের জানা অত্যাবশ্যকীয় তার সংক্ষিপ্ত ও বাস্তবমুখী বর্ণনা দেয়া হয়েছে । শিশু পরিচর্যা নির্দেশিকা হিসাবে মায়েরা যদি এ পুস্তিকা অনুসরণ করে উপকৃত হন তাহলে আমার পরিশ্রম স্বার্থক হবে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বইটি সম্পূর্ণ করতে স্ত্রী শারমিন মনজুরের ছিল সবচেয়ে বেশী আগ্রহ। তার সার্বক্ষণিক প্রেরণা ও আন্তরিকতার জন্যই এ দুরূহ কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় অগ্রজ এম আখতার আলী যার অকৃত্রিম স্নেহ ও চেষ্টায় আমি আজ শিশু বিশেষজ্ঞ হয়ে এ পুস্তিকা রচনা করতে সক্ষম হয়েছি –তাকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এ পুস্তিকা লেখার ব্যাপারে বন্ধু ডাঃ জাফর উল্লাহ সিকদার এর কাছ থেকে পেয়েছি প্রচুর সাহায্য ও সহযোগিতা— সেজন্য তাকে জানাই ধন্যবাদ।

এছাড়া শ্রদ্ধেয়া মিসেস সিতারা আলমগীর ও কবি মুজিবুল হক কবীর পান্ডুলিপি পড়ে নানাভাবে পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করায় তাদের কাছে আমি ঋণী।

সেপ্টেম্বর ৮৯ মনজুর হোসেন

Goto List >

প্রস্তাবনা

প্রতিটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর দুধ এমনভাবে তৈরী যে জন্মের পরপর তার সন্তানের প্রাথমিকভাবে প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য তা সহায়ক । তাই মানব শিশুরও সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন মায়ের দুধ।

মায়ের দুধ খাওয়া শিশুর জন্মগত অধিকার। শিশুর জন্য মায়ের দুধ সর্বোত্তম। এর কোন বিকল্প নেই।

মায়ের দুধ –

ক) শিশুকে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে উঠতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে;

খ) শিশুকে সংক্রামক ব্যধি ও এলার্জি হওয়া থেকে রক্ষা করে – তাই ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া যেমন কম হয় তেমনি একজিমা, এজমা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী;

গ) সহজেই হজম হয়; এবং

ঘ) সহজে খাওয়ানো যায়।

এছাড়া মায়ের দুধ খাওয়ালে –

ক) মা ও শিশুর সম্পর্ক গভীর হয়; এবং

খ) প্রসবের পর জরায়ু তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে যায়।

বিশেষত : মা ও সন্তানের সম্পর্ক গভীর না হলে শিশু নিরাপত্তা হীনতায় ভোগে এবং পিতা মাতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রায়ই অস্বাভাবিক কাজে লিপ্ত হয়। জন্মের পর মায়ের দুধ খাওয়ার মাধ্যমেই শুরু হয় শিশুর নিরাপত্তা বোধ। তাই যে শিশু মায়ের দুধ খায়নি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। এ পুস্তিকা অনুসরণ করলে পিতা-মাতা ও সন্তানের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে উঠার অন্তরায় গুলি দূর করা সম্ভব হবে বলে আশা করি।

Goto List >

শিশু স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য

১) শিশুর জন্মের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে;

২) চার থেকে ছয়মাস বয়স পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে;

৩) দিন কিংবা রাত – যখনই শিশু ক্ষুধার্ত হবে তখনই শিশুকে বুকের দুধ খেতে দিতে হবে ;

৪) শিশু অথবা মায়ের অসুস্থতার সময়েও শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে;

৫) চার থেকে ছয়মাস বয়সে শিশুর অতিরিক্ত পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য যখন নতুন খাবার সংযোজন করা হয় তখনও বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে ; এবং

৬) দুধের বোতল এবং চুষনি জাতীয় জিনিস যা শিশুকে সান্তনা দেয় তা পরিহার করতে হবে।

বাচ্চার স্বাস্থ্যের বিকাশের জন্য মায়ের দুধ সর্বোত্তম – তাই মাকেও পর্যাপ্ত পরিমানে সুষম খাবার খেতে হবে।

Goto List >

সুন্দর ও সুস্থ চোখের জন্য

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান

প্রতিদিন অবশ্যই আপনার শিশু যেন রান্না করা সবুজ শাক-সব্জি, পালং, লাল শাক ইত্যাদি এবং হলুদ ফলমুল-পেঁপে ও আম এগুলো খায়।

-যা পুষ্টির অভাবে অন্ধ হওয়া থেকে বাচাবে।

সূচীপত্র

১. পরিচর্যার শুরু ——— ১
২. নবজাতকের পরিচর্যা ——— ২
৩. শিশু পরিচর্যার সাধারণ বিষয় ——— ৫
৪. শিশুর দৈহিক ও স্নায়বিক পুষ্টি ——— ৯
৫. শিশুর আবেগ জনিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ——— ১৩
৬. টিকা ——— ১৬
৭. শিশুর খাদ্য ——— ১৯
৮. শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা ——— ২২
৯. সাধারন রোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা ——— ২৭
১০. কখন ডাক্তার দেখাতে হবে ——— ৩১
১১. পরিশিষ্ট ঃ
ক) শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা বিধি ——— ৩২
খ) প্রায়োগিক দিক ——— ৩৩
গ) স্মরণীয় ——— ৩৪
ঘ) সহায়ক গ্রন্থ ও সাময়িকী ——— ৩৫

Goto List >

১. পরিচর্যার শুরু

"When a child is born it is already nine months old". (যখন একটি শিশু জন্ম গ্রহন করে – তখন তার বয়স নয়মাস অতিক্রম করেছে)।

মায়ের গর্ভে প্রাণ সঞ্চারের পর থেকে শিশু ধীরে ধীরে মায়ের গর্ভে বাড়তে থাকে। এ সময়ে শিশুর বৃদ্ধি এমনভাবে হয় যাতে জন্মের পর সে নতুন পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। মায়ের গর্ভে শিশুর খাবারের একমাত্র উৎস হল মা। তাই মায়ের শরীর থেকে প্রয়োজনীয় আমিষ, শর্করা, স্নেহ, বিভিন্ন খনিজ লবন ও ভিটামিন জরায়ুর মাধ্যমে শিশু নিয়মিত যোগাড় করে নেয়। গর্ভে সন্তানের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তাই মাকে স্বাভাবিক খাবারের চেয়ে এক চতুর্থাংশ খাবার বেশী খেতে হবে – তাহলেই সুস্থ শিশু জন্ম গ্রহন করবে।

গর্ভবতী মা যদি সুষম খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমানে গ্রহন না করেন তা হলে গর্ভস্থ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। মায়ের অপুষ্টির জন্য সাধারনত: দুর্বল শিশু জন্ম গ্রহন করে এবং তাদের জন্ম ওজনও খুব কম হয়ে থাকে। ফলে তারা নানা ধরনের অসুবিধা ও রোগের সম্মুখীন হয়। তাই গর্ভস্থ শিশুর যত্ন নিতে হলে মাকে সুষম খাবার ১বার বেশী খেতে হবে। এছাড়া কমপক্ষে এক গ্লাস বা এক পোয়া দুধ প্রতিদিন খেতে হবে।

এছাড়া মায়ের উচ্চ রক্ত চাপ, বিভিন্ন সংক্রামক ব্যধির সংক্রমন ও রক্তশূন্যতা জনিত কারনে অপুষ্ট শিশু জন্ম নেয়। তদুপরি বিভিন্ন ঔষধ এই সময়ে শিশুর বৃদ্ধিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। বাচ্চা পেটে আসার পর থেকে প্রসব পর্যন্ত পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিলেও বাচ্চার অসুবিধা হতে পারে। তাই গর্ভস্থ শিশুর স্বাভাবিক জন্ম লাভের জন্য যথা শীঘ্র রক্ত শূন্যতা দূরীকরন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ সেবন এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম সুস্থ শিশু লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

গর্ভবতী মা যদি গর্ভকালীন সময়ে টিটেনাসের টিকা নেন তাহলে নবজাত শিশু ধনুষ্টংকারের আক্রমন থেকে রক্ষা পায়। তাই টিটেনাসের টিকা পেটে বাচ্চা নড়াচড়া শুরু করলেই নিতে হবে।

এছাড়া তামাক ও জর্দা সেবন, ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবন করলে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হতে পারে। তাই অনাগত শিশুর সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করতে এসব কুঅভ্যাস পরিত্যাগ বান্ছনীয়।

একটি সুপুষ্ট, সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু অর্জন করতে হলে ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকের অধীন গর্ভবতী মায়ের প্রসব পূর্ব পরিচর্যা সেবা গ্রহন করা প্রয়োজন।

Goto List >

২. নবজাতকের পরিচর্যা

শিশুর জন্মের পর প্রথম চার সপ্তাহের মধ্যে মাতৃগর্ভের পরিবেশ মুক্ত হয়ে নতুন জগতের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে হয় বলে এই সময়ের পরিচর্যা তাকে নিয়মিত বেড়ে উঠতে এবং স্বাস্থ্যবান হতে সাহায্য করে।

শালদুধ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যধির হাত থেকে এ সময় শিশুকে বাঁচায়।

জন্মের পরপরই শিশুর চারটি মৌলিক চাহিদা গুরুত্ব সহকারে মিটাতে হয় :

১) **খাবার ঃ** ক) জন্ম লাভের পরপরই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা বাঞ্ছনীয়।

খ) বুকের দুধ কম – এই অজুহাতে শিশুকে বোতলের দুধ খাওয়ানো উচিৎ নয়।

দুধ খাওয়ানোর সময় লক্ষ্য রাখুন: শিশুর মাথা যেন শরীর থেকে একটু উপরের দিকে থাকে এবং মায়ের স্তনের বোঁটা যেন শিশুর মুখের ভিতরে থাকে। প্রতিবার দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে নিজের কাঁধের উপর নিয়ে একটু ঘোরাফেরা করলে এবং পিঠে হাত বুলালে শিশু ঢেকুর দিয়ে পেটের বাতাস বের করে দিবে।

২) **পরিবেশ ঃ** জন্মের পরপরই শিশুকে উষ্ণ পরিবেশে রাখতে হবে। শিশুকে ঠান্ডা থেকে রক্ষা করুন এবং প্রয়োজন মাফিক গরম পোষাক পরান। শিশুকে অতিরিক্ত বা বেশী গরম থেকেও রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে শিশুকে নেংটা রাখুন।

৩) **পরিচ্ছন্নতা ঃ** পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মাবলী মেনে চললে শিশু স্বাস্থ্যবান ও সবল থাকতে পারে।

ক) গোসল ঃ জন্মের এক থেকে দু ঘন্টা পর ঈষদুষ্ণ বা কুসুম গরম পানি এবং কোমল সাবান দিয়ে গোসল করাতে হবে। প্রতিদিন বা একদিন পর পর এন্টিসেপটিক বা বীজানু প্রতিরোধকারী ঔষধ মিশানো ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে শিশুকে গোসল করানো প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে : গোসলের সময় কানে যেন পানি না ঢুকে।

খ) নাভি রজ্জু ঃ নতুন কাটা নাভি রজ্জু পরিস্কার এবং শুকনা রাখতে হবে। যত তাড়াতাড়ি নাভি রজ্জু শুকাবে তত তাড়াতাড়ি এটা পরে গিয়ে নাভি সেরে উঠবে। তাই প্রতিবার বাচ্চার গোসলের পর নাভির যত্ন নিতে হবে। নাভিতে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো কর্ড পাউডার বা জীবানু নাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।

গ) শিশুর পরণের ন্যাপি বা নেংটি এবং বিছানা ভিজা মাত্র পালটিয়ে দিতে হবে। ঘন ঘন শিশুর কাপড় পালটাতে হবে। কখনো ময়লা কাপড় পরতে দিবেন না।

Goto List >

ঘ) ধূয়া এবং ধুলাবালি থেকে দূরে পরিস্কার জায়গায় শিশুকে রাখুন। মশামাছির উপদ্রবে মশারি দিয়ে শিশুকে ঢেকে রাখতে হবে।

৪) নিরাপত্তা ঃ নাড়ি কাটার পরপর শিশুকে যথাশীঘ্র সম্ভব মায়ের বুকের কাছে রাখতে হবে। মায়ের বুকে শিশুর এই আশ্রয় — শিশু পরিচর্যার অন্যতম শর্ত। নবজাতককে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে একজন স্নেহের সাথে তার নিরাপত্তা বিধান করছে।

নবজাত শিশু যত্নের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় ঃ

ক) ঘুম ঃ জন্মের পর প্রথম দুই সপ্তাহ শিশু খাবার খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়ে। শিশুকে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাবার অভ্যাস করাতে হয়। শিশু জন্মের পর সাধারনত: প্রতিদিন ১৬ থেকে ১৭ ঘন্টা ঘুমায়। ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে ঘুম কিছুটা কমে ১৪ থেকে ১৫ ঘন্টায় নেমে আসে। ৬ মাস বয়সে শিশু প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ ঘন্টা ঘুমায়।

খ) কান্না ঃ শিশুর কান্নার কারন অনুসন্ধান করে সেইমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। শিশু সাধারণতঃ ক্ষুধা লাগলে, পিপাসা লাগলে, পেশাব পায়খানা করে ভিজলে এবং ব্যথা পেলে কাঁদে। ক্ষুধার জন্যই শিশু কাঁদে সব সময় এরকম মনে করা ভুল। অনেক সময় তার কান্না মাতৃক্রোড়ে স্পর্শাতুর হৃদয়ের আকুতি। তবে শিশু কাঁদার সাথে সাথে স্নেহ স্পর্শ কান্নার প্রবণতা কমিয়ে দেয়।

গ) বমি ঃ সাধারণতঃ খাওয়ানোর পর শিশুর পেট থেকে বাতাস বের না করে তাকে শোয়ালে, পেটের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশী খাবার খাওয়ালে, এবং হজম ক্ষমতার তুলনায় বেশী ঘন খাবার খেতে দিলে শিশুরা বমি করে।

ঘ) গোসলের আগে শিশুর গায়ে অলিভ অয়েল বা তেল মাখা যেতে পারে। বেবী লোশন, বেবী পাউডারও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে গরম কালে বেশী তেল মাখলে ঘামাচি ও চর্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

ঙ) যে শিশু বুকের দুধ খায় তাকে বোতলে করে কিছু খাওয়ানো ঠিক নয়। প্রয়োজনে চামচে করে খাওয়ানো যেতে পারে।

চ) মায়ের দুধের বিকল্প নেই। তবে চিকিৎসকের পরামর্শে যদি টিনের দুধ খাওয়াতে হয় তাহলে বোতলের পরিবর্তে বাটি ও চামচ ব্যবহার করাই শ্রেয়।

বোতলে দুধ খাওয়াতে হলে বোতল, নিপল ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র ভালোভাবে পরিস্কার করতে হয় এবং ফুটন্ত পানিতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হয়। দুধের কৌটায় যেভাবে দুধ প্রস্তুত প্রণালী লেখা আছে ঠিক সেইভাবে দুধ তৈরী করে খাওয়াতে হবে। মায়ের দুধ খাওয়ানোর বেলায় যে সময়সূচী বা নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় –

Goto List >

টিনের বা গরুর দুধ খাওয়ানোর বেলায়ও তা অনুসরণ করতে হবে । কখনও শিশুর মুখে ফিডার ঠেসে দিয়ে চলে যাবেন না। এতে শিশুর কান পাঁকতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এছাড়া মায়ের এধরণের অমনোযোগিতা শিশুর মায়ের প্রতি নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয়–ফলে শিশু নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

গরুর দুধ ঃ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুকে গরুর দুধ খাওয়াতে হলে নীচে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী গরুর দুধ পাতলা করে তৈরী করতে হবে।

গরুর দুধ পাতলা করে তৈরী করার নিয়ম ঃ

১) ২ ভাগ দুধ ১ ভাগ সিদ্ধ ঠাণ্ডা পানির সাথে মিশাতে হবে;
২) এইভাবে তৈরী পাতলা দুধে – প্রতি ১ পোয়া (২৪০ মি ঃ লি ঃ) দুধের জন্য আড়াই (২ ১/২) চায়ের চামচ চিনি মিশাতে হবে; এবং
৩) এই দুধকে ফুটাতে হবে।

কিছুক্ষণ এই দুধ ফুটন্ত অবস্থায় থাকার পর চুলা থেকে নামাতে হবে এবং কুসুম গরম অবস্থায় এই দুধ শিশুকে খাওয়াতে হবে।

শুধু গরুর দুধ খাওয়ালে আয়রন ও ভিটামিন খাওয়াতে হয় । এছাড়া টিনের দুধ খাওয়াতে যে সতর্ক তা অবলম্বন করা হয় – গরুর দুধ খাওয়ানোর বেলায়ও তা করতে হবে।

ছ) জণ্ডিস ঃ জন্মের পর অনেক শিশুর স্বাভাবিকভাবে জণ্ডিস দেখা দিতে পারে। সাধারনতঃ নবজাতকের ২ দিন বয়স থেকে ৬ দিনের মধ্যে এই জণ্ডিস দেখা দেয় এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে তা সেরে যায়। এই সময়ে মায়ের দুধ শিশুকে খাওয়াতে হয় এবং সেই সাথে সকাল বেলায় শিশুকে খালি গায়ে রোদে রাখা অত্যন্ত উপকারী । তবে মনে রাখতে হবে – শিশুর মাথায় যেন সূর্যের আলো সরাসরি না পড়ে ।

শিশুর জন্মের পরপরই যদি জণ্ডিস দেখা দেয় অথবা ৭ দিন বয়সের পর জণ্ডিস দেখা দেয় অথবা জণ্ডিসের হলুদ রং দিন দিন গাঢ় হতে থাকে তবে ডাক্তার দেখাতে হবে ।

মনে রাখবেন ঃ নবজাতকের অসুখ দ্রুত অবনতির দিকে যায়। শিশুর রোগের প্রাথমিক লক্ষণেই সুচিকিৎসা প্রয়োজন।

Goto List >

৩. শিশু পরিচর্যার সাধারণ বিষয়

সুস্থ শিশু দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক ও মানসিক বিকাশ শিশুর বয়সের সাথে সঙ্গতি রেখে ঘটতে থাকে। যে শিশু নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করে, চাহিদা অনুযায়ী ঘুমায় এবং সুন্দর ও সুখী থাকে সেই শিশুই সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশু।

সুস্থ শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের চাহিদা :

১) শরীরের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এবং পরিমিত পুষ্টি সরবরাহ অর্থাৎ বয়স অনুযায়ী সুষম খাবার ;
২) প্রশান্তিতে ঘুমানোর সুব্যবস্থা ;
৩) অঙ্গ সঞ্চালন ও ঘোরাফেরার স্বাধীনতা ;
৪) অফুরন্ত ভালোবাসা, সেবা, যত্ন ও তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা ; এবং
৫) দুর্ঘটনা থেকে নিরাপদ রাখা।

শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের চাহিদা পুরন করতে গিয়ে মায়েদের অন্যতম সমস্যা হল – শিশুকে খাওয়ানো। শিশুকে খাওয়ানোর জন্য মায়ের মানসিক তাড়না খুবই জোরালো। অবচেতনভাবে মা তার প্রতি শিশুর ভালোবাসা পরিমাপ করেন শিশুর খাওয়ার প্রতি আগ্রহ দিয়ে। ফলে মায়ের হাতে খাওয়ার আগ্রহ কমে যাওয়াকে মা তার প্রতি শিশুর ভালোবাসা কমে যাওয়া মনে করেন । আসল সমস্যা কিন্তু অন্যখানে । প্রত্যেক মা তার শিশুকে মোটা তাজা করার জন্য খাবারের একটা পরিমান নির্দ্দিষ্ট করে শিশুকে খেতে চাপ দেন, ফলে শিশু তার পেটের ধারন ক্ষমতার বেশী খাবার খেতে পারে না। মা তখন দীর্ঘ সময় ব্যয় করে শিশুকে ঐ পরিমান খাবার খাওয়াতে সচেষ্ট হন। ক্রমাগত এধরনের চাপে পড়ে শিশুর বিরক্তি এক সময়ে প্রত্যাখান করার প্রবনতায় পরিনত হয়।

ক) মায়ের দৃষ্টিতে খাওয়ানোর ব্যাপারে সমস্যাবলী :

প্রথম বছরঃ সাধারনত: জন্মের দুই সপ্তাহের মধ্যে শিশুর মায়ের দুধ খাওয়ার ব্যাপারে একটা রুটিন বা অভ্যাস গড়ে ওঠে। কিন্তু সব শিশুরই যে খাওয়ার সময় নির্ধারিত হয়ে যাবে এধারনা ঠিক নয়। যে সমস্ত শিশুর প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেনা সে সমস্ত শিশুর মায়েরা নিজ সন্তানের ব্যাপারে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ভোগেন।

এছাড়া যখন নতুন খাবার সংযোজন করা হয় তখন সাধারনত: শিশুর দুধের প্রতি আগ্রহ কমে যায়।

দ্বিতীয় বছর : দ্বিতীয় বছরে শিশুর প্রোটিন ও ক্যালরীর চাহিদা প্রথম বছরের দ্বিগুন হওয়ার পরিবর্তে কমে যায় । অথচ মায়ের প্রত্যাশা হল শিশুকে বেশী করে খাবার খাওয়ানো।

দ্বিতীয় সমস্যা হল শিশুর নিজ হাতে নিজের খাবার খাওয়ার প্রবল ইচ্ছা। তার অনভিজ্ঞতার জন্য শিশু যতটুকু খাবার মুখে ঢোকায় তার চেয়ে বেশী চারিদিকে ছড়ায়। এভাবে খাবার ছড়ানো ছিটানোর মাঝে সে খেলার আনন্দও পায়। এ ব্যাপারে মা যত বেশী শিশুকে নিজহাতে খেতে বাধা দিবে শিশু তত বেশী খাবার খাওয়ার ব্যাপারে অবাধ্য হবে।মনে রাখতে হবেঃ এই বয়সে নিজহাতে খাবার খাওয়ার চেষ্টা তার মানসিক বিকাশের স্বাভাবিক পর্যায়ের মধ্যে পড়ে।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম বছর : এই বয়সে প্রায় সব মা অনুযোগ করেন যে তার বাচ্চা খায় না। সুস্থ বাচ্চা কখনও অভুক্ত থাকে না । শরীরের চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণ মত খাবার সে রুটিন মাফিক বা ইচ্ছামাফিক খাবেই। তাছাড়া যে সব বাচ্চা বিস্কুট,চকোলেট, আইসক্রীম খেতে অভ্যস্থ তাদের প্রধান আহারের চাহিদা এমনিতে কমে যায় ।

অনেক সময় বাচ্চা রাতে খাবার খেতে চায় না। খেতে না চাইলে পীড়াপীড়ি না করে অভুক্ত থাকতে দেয়া ভাল। তবে মনে রাখতে হবে – রাতে যদি বাচ্চার ক্ষুধা লাগে এবং খেতে চায় তবে সাথে সাথে খেতে দিবার মতো খাবার যেন তৈরী থাকে।

শিশুর ওজন যদি বয়স অনুযায়ী জন্ম ওজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বাড়তে থাকে তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে মায়ের যতই সমস্যা দেখা দিকনা কেন –মাকে নির্ভয় থাকতে হবে যে তার সন্তান সুস্থ এবং স্বাভাবিক আছে । নিশ্চিত হতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন করুন।

খ) ঘুমজনিত সমস্যাঃ শিশুকে অল্প বয়সে নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস করালে ঘুমজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বয়স অনুযায়ী শিশুর ঘুমের চাহিদা রাতে মিটানোর জন্য প্রয়োজনবোধে শিশুর ঘুমাবার সময় পিছিয়ে দিয়ে শিশুকে সারারাত ঘুমাবার বন্দোবস্ত করা যায়। শান্ত, অন্ধকার রাত এবং নিরুপদ্রব দিন শিশুর ঘুমের জন্য প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে – একজন সুস্থ শিশুর ঘুমের অভ্যাসের সাথে অন্য সুস্থ শিশুর ঘুমের অভ্যাসের মিল নাও থাকতে পারে।

গ) তিনমাস মেয়াদী পেট ব্যথাঃ তিনমাস বয়স পর্যন্ত অনেক শিশুর শেষ বিকালে অথবা সন্ধ্যার শুরুতে পেট ব্যথা হয়। ফলে শিশু কাঁদতে থাকে। শিশুকে কাঁধের উপর নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলে, তার পেটের উপর হালকাভাবে হাত বুলিয়ে দিলে এবং সামান্য গরম সেক দিলেও কোনরূপ উপকার হয়না। শিশুর মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষনের চেষ্টা এবং বুকের উপর শিশুকে রেখে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করা এ ব্যথা থেকে শিশুকে কিছুটা আরাম দিতে পারে। শিশু যদি নিয়মিত এ ব্যথায় আক্রান্ত হয়, ব্যথা যদি শিশুকে খুবই কষ্ট দেয় এবং পেটে হাত রাখা না যায় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

তিনমাসের পেটে ব্যথায় আক্রান্ত শিশুদের খাওয়ার পরিমান এবং শারীরিক ক্রমবৃদ্ধি স্বাভাবিক থাকে।

Goto List >

ঘ) ন্যাপি বা ডায়াপার র‍্যাস/ নেংটি জনিত চুলকানী ঃ শিশুর কোমরে জড়ানো নেংটির মধ্যে শিশু প্রস্রাব করলে অনেক সময় এই প্রস্রাবে ভেজা নেংটির জন্য শিশুর কুচকির ভাজে ও পাছায় লালচে রঙের র‍্যাস (ফুসকুড়ি) অথবা ঘা দেখা দেয়।

ডায়াপার র‍্যাস প্রতিরোধের উপায় ঃ ১) প্রতিদিন কমপক্ষে আধঘন্টা শিশুকে নেংটি ছাড়া খোলা জায়গায় রাখুন; ২) তারপর টেলকম পাউডার মাখুন; ৩) বারবার নেংটি পরিবর্তন করুন; এবং ৪) প্রয়োজনে ভেসেলিন মলম অথবা তেল প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

ঙ) কোষ্ঠকাঠিন্য ঃ শিশু যখন অনিয়মিত, শক্ত মল ত্যাগ করে এবং মল ত্যাগ করতে কষ্ট হয় তখন তাকে কোষ্ঠকাঠিন্য বলে। একদম ছোট বাচ্চাদের প্রচুর পানি এবং ফলের রস খেতে দিন । বড় শিশুদের বেশী করে পানি খাওয়াতে হবে, সেই সাথে আঁশযুক্ত শাক–সব্জি ও ফল খাওয়াতে হবে। ইসবগুলের ভুসির শরবতও উপকারী।

চ) দাঁতের পোকা ঃ দন্তক্ষয় বা ক্যারিজ রোগকে প্রচলিত বাংলায় দাঁতে পোকা হয়েছে বলা হয়। এ রোগ দাঁতে চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার জমে থাকলে সৃষ্টি হয়, তাই–

১) মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়ানোর পর দাঁত ভালোভাবে পরিস্কার করতে হবে;
২) শিশুর সামনের দিকের চারটি দাঁত উঠার পর থেকেই টুথ পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজতে হবে;
৩) সকালে প্রথম খাবার খাওয়ার আগে এবং রাতে শেষ খাবার খাওয়ার পর –কমপক্ষে এই দুইবার প্রতিদিন দাঁত মাজতে হবে।

ছ) কৃমি ঃ বাংলাদেশে অনুমিত প্রায় সব শিশুই কৃমি দ্বারা আক্রান্ত । যদি পরিবারের একজনেরও কৃমি থাকে তাহলে পরিবারের সবার এক সাথে কৃমির চিকিৎসা করাতে হবে। কৃমি সংক্রমন বা বিস্তারের প্রধান ৪টি মাধ্যম হল ঃ পানি, খাদ্য, মাটি ও নখ । কৃমি সংক্রমনের ফলে সাধারনতঃ খাবারে অনীহা ও পাতলা পায়খানা হতে পারে এবং পুষ্টিহীনতা ও রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

কৃমির সংক্রমনের হাত হতে রক্ষা পেতে হলে ঃ

১) খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগের পর ভালোভাবে হাত ধুতে হবে;
২) হাতের নখ ছোট করে কাটতে হবে এবং নখ সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে,
৩) বিছানা পরিস্কার করার সময় ময়লা চাদর বিছানার উপর ঝাড়বেন না;
৪) বিছানার চাদর সপ্তাহে কমপক্ষে দুইবার ধুতে হবে;
৫) ফল খাবার আগে এবং শাকসব্জি রান্নার আগে ট্যাপের চলন্ত পানিতে ধুতে হবে;
৬) পরিস্কার , নিরাপদ পানি অথবা সিদ্ধ পানি পান করতে হবে;
৭) কমোড ব্যবহার করলে বসার স্থান প্রতিদিন ঘষে পরিস্কার করতে হবে; এবং
৮) মাঠে ময়দানে হাঁটার সময় জুতা বা সেন্ডেল পরতে হবে।

Goto List >

জ) দুর্ঘটনা এড়ানো : শিশু তার স্বাভাবিক কৌতুহল নিবারনের জন্য আগুন, গরম পানি, ইলেক্ট্রিক তার, গরম ইস্ত্রি ইত্যাদিতে হাত দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করতে পারে । টেবিলের উপর কি জিনিস আছে তা দেখার জন্য টেবিল ক্লথের ঝুলন্ত অংশ ধরে টান দিয়ে সমস্ত জিনিস ফেলে দিতে পারে।

তাই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য লক্ষ্য রাখুনঃ

১) শিশু যেন পড়ে না যায়;
২) আগুন এবং গরম পানি থেকে শিশু যেন নিরাপদ থাকে;
৩) বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র এবং তার থেকে শিশু যেন নিরাপদ থাকে ;
৪) শিশু যেন প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে খেলাধুলা না করে–এতে দম বন্ধ হবার সম্ভাবনা আছে; এবং
৫) ঔষধ ও বিষাক্ত জিনিস শিশুর হাতের নাগালে না থাকে।

ঝ) এলার্জিঃ এলার্জি বংশানুগত প্রভাবেই বেশীরভাগ বাচ্চার হতে দেখা যায় । তাই অনেক বাচ্চাকে খাদ্য সম্পর্কিত এলার্জিতে আক্রান্ত হতে দেখা যায় । যে কোন খাবার সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া কমপক্ষে দুইবার ঐ খাবার গ্রহনের পর দেখা দিলে তা এলার্জি সংক্রান্ত বলে ধরে নেয়া হয়।

বাচ্চাদের সাধারনত: গরুর বা টিনের দুধ, ডিম, টক বা সাইট্রাস ফল, মাছ, টমেটো ও বাদাম জাতীয় খাদ্যে এলার্জী হয়। তবে যে কোন খাবারই এলার্জীর কারন হতে পারে। এলার্জীর কারনে বাচ্চাদের ডায়ারিয়া (রক্ত, আম মিশ্রিত মল), পেটে ব্যথা, চামড়া লাল হয়ে ফুলে উঠা, একজিমা এবং হাপানী হয়।

যদি কোন খাবারে এলার্জী আছে সন্দেহ হয় তবে শুধু ঐ খাবার সপ্তাহে একদিন খেতে দিয়ে দেখতে হবে এলার্জী হয় কিনা। যদি এলার্জী হয় তবে কমপক্ষে ছয়মাস ঐ খাবার আর দেয়া যাবে না।

Goto List >

৪. শিশুর দৈহিক ও স্নায়বিক পরিপুষ্টি

শিশুর দেহের বৃদ্ধি অতি সহজেই চোখে ধরা পরে। মায়েরা সাধারনত: একই বয়সের দুইটি শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং আকার দেখে স্বাস্থ্যের মান নির্নয় করেন। প্রতিটি শিশুর দেহের এবং স্নায়ু বা নার্ভের পরিপুষ্টির গতি এক নয়। জন্মের সময় শিশুর ওজন এবং তারপর তার পুষ্টি সরবরাহ এবং রোগ বালাই তার শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি নির্ধারিত করে।

শিশুর জন্ম ওজন দ্বিগুন হয় ৫–৬ মাস বয়সে ; তিনগুন হয় ১২ মাস বয়সে এবং চারগুন হয় ৩০ মাস বয়সে। তাই জন্ম ওজনের পার্থক্যের কারনে দুইটি স্বাভাবিক শিশুর দৈহিক বৃদ্ধিতে তারতম্য দেখা দিতে পারে। তবে প্রতিটি শিশুর মাঝে স্বাভাবিক শিশুর ওজন পর্যন্ত পৌছানোর সুপ্ত ক্ষমতা থাকে, তাই জন্ম ওজন যাই হোক না কেন পর্যাপ্ত পরিচর্যা তার পর্যাপ্ত ওজন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

প্রথম বছরে ঈপ্সিত ওজন এবং উচ্চতা বৃদ্ধি

বয়স (মাস)	ওজন বৃদ্ধি(মাসে)	বয়স (বছর)	উচ্চতা বৃদ্ধি(বছরে)
১–২	৭০০ গ্রাম	১ বছর	২৫ সে: মি:
৩–৪	৬০০ গ্রাম	২ বছর	১২ সে: মি:
৫–৬	৫০০ গ্রাম	৩ বছর	১১ সে: মি:
৭–৮	৪০০ গ্রাম	৪ বছর	৬ সে: মি:
৯–১০	৩০০ গ্রাম	৫ বছর	৫ সে: মি:
১১–১২	২০০ গ্রাম		

দ্বিতীয় বছরে সাধারনত: আড়াই কিলোগ্রাম এবং তারপর প্রতিবছর কমপক্ষে দুই কিলোগ্রাম করে ওজন বাড়তে থাকে।

শিশুর দৈহিক ও স্নায়বিক পরিপুষ্টি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা প্রতিটি সচেতন মা কোন বয়সে শিশুর কি করার কথা তা অনুসরন করলেই বুঝতে পারবেন।

৬ সপ্তাহঃ

আওয়াজ শুনলে মুখের সন্ধান করে
মুচকি হাসে
আওয়াজ শুনলে চমকে ওঠে

Goto List >

৬ মাস ঃ

অর্থপূর্ন হাসে
আধো শব্দে আনন্দ ও বেদনা প্রকাশ করে
আধো আধো অস্পষ্ট কথা বলে
ঠেস দিয়ে রাখলে বসতে পারে
খেলনা একহাত থেকে আরেক হাতে নিতে পারে

৮ মাস ঃ

হামাগুড়ি দেয়
বসতে পারে
শুয়ে গড়াগড়ি যেতে পারে

৯ মাস থেকে ১১ মাস ঃ

জিনিস মুখে দেয়
নিজের নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়
ধরে রাখলে দাঁড়াতে পারে
আঙুল দিয়ে দেখায়

১২মাস থেকে ১৫ মাস ঃ

হাত তুলে বিদায় সম্ভাষন জানাতে পারে
কাপ থেকে খেতে পারে
মা ও বাবা বলতে পারে
নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে কান্না ছাড়াও দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারে
একা হাঁটতে পারে
নতুন লোক দেখলে লজ্জা অথবা ভয় পায়
কয়েকটি শব্দ বলতে পারে

১৮ মাস ঃ

নিজেই জুতা মোজা খুলতে পারে
পেশাব পায়খানা করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারে
চামচ ধরতে পারে এবং তা দিয়ে খাবার মুখে দিতে পারে
সাধারন নির্দেশ যথা দরজা বন্ধ কর –পালন করতে পারে
বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে পারে
এক হাত ধরে রাখলে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে
হাঁটার সময় খেলনা হাতে ধরে রাখে

Goto List >

২ থেকে আড়াই বছর :

কাপড় পরে থাকে এবং দিনের বেলায় পেশাব করে কাপড় নষ্ট করে না
একা একা খেলা ধুলা করে
বলে লাথি মারে
একই জায়গায় থেকে লাফালাফি করে
সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করতে পারে

৩ বছর :

বড়দের সহায়তায় কাপড় পরতে পারে
একা একা টয়লেটে যেতে পারে
নিজের পুরা নাম ও বয়স বলতে পারে
অনর্গল নানান প্রশ্ন করে
অল্পক্ষনের জন্য এক পায়ে দাঁড়াতে পারে
বাচ্চাদের ৩ চাকার সাইকেল চালাতে পারে
রং চিনতে পারে

৪ বছর :

একা একা কাপড় চোপড় পরতে পারে
হাত ধুয়ে তা মুছে ফেলতে পারে
দাঁত মাজতে পারে
বিভিন্ন রং এর পার্থক্য বুঝতে পারে
সম্পূর্ন নাম ঠিকানা বলতে পারে
দশ পর্যন্ত গুনতে পারে
আঙ্গুলে ভর দিয়ে হাঁটতে পারে

৫ বছর :

দল বেধে খেলাধুলা করে
নিজেই নিজের বন্ধু ঠিক করে
বন্ধুর দুঃখে সান্তনা দেয়
স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে
সুঁইতে সুতা ভরতে পারে
বল মাটিতে ড্রপ দিয়ে ক্যাচ ধরতে পারে

যদি আপনার বাচ্চা :

৬ মাস বয়সে ঠেস দিয়ে রাখলে বসতে পারে
৮মাস বয়সে ঠেস ছাড়া বসতে পারে
৯ থেকে ১২ মাস বয়সে দাঁড় করিয়ে রাখা যায়

Goto List >

১২ থেকে ১৮ মাস বয়সে একা দাঁড়াতে , হাটতে ও দৌড়াতে পারে; এবং
৩ বছর বয়সে তিন চাকার সাইকেল চালাতে পারে

তবে আপনার শিশুর মোটর নার্ভ বা চালক স্নায়ুর পরিপুষ্টি ঠিকমত হচ্ছে ধরে নিতে হবে।

এছাড়া শিশুর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক কিনা এবং নিয়মিত ও স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে, ৬ সপ্তাহ বয়সে, ৬ মাস বয়সে, ১০ মাস বয়সে এবং ১৮ মাস বয়সে একবার করে শিশুকে চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানো প্রায়োজন। স্বাভাবিক ও সুস্থ শিশুর কমপক্ষে তিনমাসে একবার ওজন ও উচ্চতা দেখা দরকার। মাসে একবার করে ওজন নিতে পারা সর্বোত্তম।

Goto List >

৫. শিশুর আবেগ জনিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা

শিশুর সুষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য পারিবারিক শান্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবনের প্রথম বছরেই শিশু চিন্তা করার শক্তি অর্জন করে এবং চিন্তা শক্তি প্রয়োগের একটা আকৃতি বা মডেল মনের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়।

প্রথম মাস ঃ প্রথম মাসেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের স্বাক্ষর হল মায়ের দুধ খাওয়ার মাধ্যমে। সে ধীরে ধীরে শিখে নেয় কিভাবে স্তন চুষলে বেশী দুধ খেতে পারবে। মানসিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষনও প্রথম মাসে দেখা যায় গিলে খাওয়ার মাধ্যমে যা সচেতন অবস্থায় বেঁচে থাকার জন্য প্রতিবর্তী ক্রিয়া।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ মাস: এ সময়ে বিভিন্ন কাজে নিপুনতা বৃদ্ধি পায় এবং এ সময়ে –

১) একই ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তি করে;
২) একই ধরনের কাজের বিকল্প অনুসন্ধান করে যথা মায়ের স্তন চোষার পরিবর্তে আঙুল চোষা;
৩) অঙ্গ সঞ্চালন বা আওয়াজের অনুকরন করে; এবং
৪) আশে পাশের জিনিস তাকে আকৃষ্ট করে ও চলমান বস্তু দৃষ্টি আকর্ষন করে।

পঞ্চম থেকে সপ্তম মাস ঃ এই বয়সে বিভিন্ন চেহারার মধ্যে পার্থক্য নির্নয় করতে পারে । অন্যের দৃষ্টি আকর্ষন করতেও উৎসুক হয়। কেউ তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলে তাও অনুভব করে। স্পর্শের মাধ্যমে সে বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি সম্বন্ধে ধারনা গ্রহন করে।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ মাস ঃ এই বয়সে সে তার ইচ্ছা ও অঙ্গ সঞ্চালনকে স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রন করতে পারে। এই বয়সে শিশুর মনে "কিছু করলেই কিছু ঘটে" এ ধারনার জন্ম নেয়। এই সময় শিশুর পেশী সঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং বিছানায় গড়াগড়ি যাওয়া থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে শিখা পর্যন্ত এ তাড়না প্রবল থাকে ।

কোন জিনিসের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করার ব্যাপারে পিতামাতার ভূমিকাই মুখ্য। শিশুদের স্বনিয়ন্ত্রনের জন্য নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতে হয়। শিশুর উপর নিয়মানুবর্তিতার নিয়ন্ত্রন বা তার কাজের সীমানা ধীরে ধীরে আরোপ করতে হয়। ফলে শিশু নিজের কাজের সিদ্ধান্ত নিজে গ্রহন করতে পারে এবং ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহন করতে পারে কিন্তু তাতে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না।

শিশুর আবেগজনিত কারনে সৃষ্ট সমস্যাবলী:

ক) জেদী শিশু ঃ দেড় বছর বয়সে শিশুর কাছে মা–বাবা শিশুর কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা মেনে চলা আশা করে । অথচ এই সময়ে শিশু তার চলাফেরার স্বাধীনতা এবং ইচ্ছাশক্তি ও কামনার পুরাপুরি প্রয়োগ করতে চায়। মা – বাবা যদি কঠোরভাবে শিশুর ইচ্ছাশক্তি ও

Goto List >

কামনা নিয়ন্ত্রন করতে চায় তখন শিশু হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে । তার এ হতাশা প্রকাশ পায় রাগের মাধ্যমে । রাগ প্রকাশ যদি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায় তখন জেদী শিশুতে পরিনত হয়। কিছু কিছু জেদী শিশু বিশেষ কোন কারনে খুব রেগে গেলে কাঁদতে কাঁদতে শ্বাস বন্ধ করে ফেলে – এসময় তারা নীল হয়ে যেতে পারে এবং হাত পা শক্ত হতেপারে ও ঝাকি দিতে পারে । এটা কোন রোগ নয় এবং এতে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না।

রেগে গেলে এ ধরনের শিশুকে ধৈর্যের সাথে বুঝানোর চেষ্টা করতে হয় এবং রাগ কথার মাধ্যমে প্রকাশ করা শিখাতে হয়। খেলাধুলা বা অন্য কাজে তাকে বেশী সময় ব্যয় করার ব্যাপারে আকৃষ্ট করতে হয়।

খ) আঙুল চোষা: চোষনের মাধ্যমে শিশু তার মানসিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রন করে। যখন শিশু ক্লান্ত থাকে, চারিদিক ফাঁকা মনে হয় অথবা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে তখন আঙুল চোষে । মনোবিজ্ঞানীদের মতে চোষন ক্রিয়া শিশুর আঅতৃপ্তিতে সাহায্য করে ।

শিশুর মধ্যে আঙুল চোষার প্রবনতা দেখা দেয়া মাত্র শিশুর প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে এবং অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শনের মাধ্যমে তার পিছনে বেশী সময় ব্যয় করে নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। তবেই শিশু আঙুল চোষার মত বদ অভ্যাসের পরিবর্তে ধীরে ধীরে অন্যকিছুতে আঅতৃপ্তি খুঁজবে।

গ) প্রক্ষালন বা মলমূত্র ত্যাগ এবং বিছানায় পেশাব করা :

আঠার-বিশ মাস বয়সের আগে শিশু পেশাব-পায়খানার বেগ পুরাপুরি নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। তাই প্রক্ষালন প্রশিক্ষনের সময় চারটি প্রক্রিয়া ক্রমানুয়ে শিখাতে হয় :— প্রথমত: পেশাব পায়খানার বেগ এবং অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতনতা; দ্বিতীয়ত: পেশাব পায়খানা ত্যাগ করায় পদ্ধতি; তৃতীয়ত: পেশাব পায়খানা করার প্রয়োজনীয়তা; এবং চতুর্থত: কোথায় পেশাব পায়খানা করবে তা শিখানো ।

এজন্য শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রশিক্ষনের সময়ের ভুলভ্রান্তিকে ধৈর্যের সাথে সহজভাবে গ্রহন করে উৎসাহিত করলে তাড়াতাড়ি মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস গড়ে উঠে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস করাতে হয় এবং এজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাথরুম বা পটিতে প্রত্যেক দিন বসাতে হয় । বসে সে মলত্যাগ করুক আর নাইবা করুক এতে কিছু আসে যায় না – অভ্যাস করানোই বড় কথা। সাধারনত: এক বছর বয়স থেকে মলত্যাগ অভ্যাস শিখানো শুরু করতে হয়।

সাধারনত: আড়াই থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের মধ্যে বেশীর ভাগ শিশুই বিছানায় পেশাব করেনা ; তবে কোন কোন শিশু পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বিছানায় পেশাব করে। সাধারনত: ১৫ মাস থেকে ২ বছর বয়সের মধ্যে শিশুকে পেশাব নিয়ন্ত্রনের প্রশিক্ষন শুরু করতে হয়। রাতের বেলায় তরল খাবার এবং পানীয় নিয়ন্ত্রন করতে হয় এবংপেশাব করানোর জন্য ২ থেকে ৪ বার শিশুর ঘুম ভাঙাতে হয় । এইভাবে ধৈর্যের সাথে শিশুর বিছানায় পেশাব করা নিয়ন্ত্রন করতে হয়।

তবে শিশু আবেগজনিত বা মানসিক সমস্যার জন্যও বিছানায় পেশাব করে। এই সমস্ত শিশু জেদী হতে পারে, অত্যন্ত লাজুক হতে পারে , ভাইবোনদের প্রতি অতিমাত্রায়

Goto List >

ঈর্ষাপরায়ন হতে পারে 'এবং স্কুলে তাদের লেখা পড়ার সমস্যা থাকতে পারে । তাই আবেগজনিত বা মানসিক সমস্যার জন্য যদি শিশু বিছানায় পেশাব করে তবে তার মানসিক সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিছানায় পেশাব করার সম্ভাবনাই বেশী।

মনে রাখবেন: সাধারনত: ১৫ থেকে ১৮ মাস বয়সে শিশু বলতে পারে যে পেশাবে কাপড় ভিজে গেছে ।২ বছর বয়সে সে পেশাবের বেগের কথা বলতে পারে কিন্তু বেগ নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। তাই আড়াই বছর বয়সে সহানুভূতিশীল পিতা-মাতা তাকে দিনের বেলায় পেশাব করে কাপড় ভিজানোর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

Goto List >

৬. টিকা

ছোট শিশুদের ছয়টি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে সহজেই বাঁচানো যায়। রোগ ছয়টি হল ডিফথেরিয়া , হুপিং কাশি , টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার , পোলিও, হাম ও যক্ষ্মা। বাংলাদেশে প্রতি বছর আড়াই লাখের চেয়েও বেশী শিশু এই ছয়টি রোগে মারা যায় । একমাত্র খাওয়ার টিকা পোলিও ও অন্যান্য ইনজেকশনের টিকা দিয়ে শিশুদের এইসব অসুখ হওয়া থেকে বাঁচানো যায় ।

শিশুকে পুরাপুরিভাবে সব কয়টি টিকা দিলে তার ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও , হাম ও যক্ষ্মা হবার ভয় থাকে না । তবে শিশুকে বাঁচাতে হলে সবগুলি টিকা সময়মতো, নিয়মমাফিক এবং পূর্ণ ডোজ দিতে হবে।

*টিকাদানের আদর্শ সময়সূচী (ই.পি.আই) :

কোন টিকা	কখন
বি সি জি	জন্মের পরপরই (১ডোজ)
ডি পি টি ও পোলিও	৬ সপ্তাহ বয়সে (১ম ডোজ)
ডি পি টি ও পোলিও	১০ সপ্তাহ বয়সে (২য় ডোজ)
ডি পি টি ও পোলিও	১৪ সপ্তাহ বয়সে (৩য় ডোজ)
হাম	৯ মাস বয়সে (১ ডোজ)

উল্লেখিত বয়সের আগে এসব টিকা দেয়া যাবে না, তবে ২ বছর বয়সের মধ্যে শিশুকে উপরোক্ত টিকাসমূহ দিয়ে দেয়া বান্ছনীয়।যত তাড়াতাড়ি টিকা দেয়া যায় ততই মঙ্গল।

যদি কোন শিশুকে ২ বছর বয়সের মধ্যে উপরোক্ত টিকাসমূহ দেয়া না হয়ে থাকে তা হলে নিম্ন সূচী অনুযায়ী টিকা দিতে হবে ঃ

কোন টিকা	কত ডোজ	
বি সি জি	১ ডোজ	টিউবারকুলিন পরীক্ষা করে
ডি টি	২ ডোজ	১ মাস পর পর
পোলিও	৩ ডোজ	১ মাস পর পর

বুষ্টার টিকা ঃ রোগ প্রতিরোধকারী টিকা সমূহের উপরোক্ত কোর্সকে প্রাথমিক টিকাদান বলা হয়। প্রাথমিক টিকার কোর্স শেষ হবার পর নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ অন্তর ১ ডোজ করে নিলে টিকাসমূহের সুফল দীর্ঘদিন ভোগ করা যায়। প্রাথমিক টিকা নেয়ার পর এই টিকার ডোজ গ্রহন করাকে বুষ্টার টিকা বলে।

Goto List >

বুষ্টার টিকা	কখন	কত ডোজ
ডিপিটি ও পোলিও	৩য় ডোজ প্রাথমিক টিকার ১ বছর পর	১ ডোজ
ডিটি ও পোলিও	২য় ডোজ প্রাথমিক টিকার ১ বছর পর	১ ডোজ
ডিটি ও পোলিও	৪ থেকে ৬ বছর বয়সে (স্কুলে ভর্তি হবার সময়)	১ ডোজ
ডিটি (বড়দের) অথবা টি.টি	১২ থেকে ১৪ বছর বয়সে	১ ডোজ

এর পর প্রতি ১০ বছর পর পর বড়দের ডি টি অথবা টি টি টিকা ১ডোজ করে নিতে হয়।

টিকার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঃ

টিকার সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে মায়েদের ধারনা থাকা বান্ছনীয়

টিকা	সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	মায়ের করনীয়
ডিপিটি	১) ২–৩ দিন সামান্য জ্বর ২) টিকার স্থানে সামান্য ফোলা ও লাল হয়ে যাওয়া	বাচ্চাকে অধিকপরিমানে তরল খাবার এবং মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে
	৩) খিচুনি হতে পারে অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে	**শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে**
ডিটি	১) ২–৩ দিন সামান্য জ্বর ২) টিকার স্থানে ফোলা এবং লাল হয়ে যাওয়া	বাচ্চাকে অধিক পরিমান তরল খাবার এবং মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে
হাম	১) সামান্য জ্বর ও দানা বা র‍্যাস ৫–৬ দিন পর দেখা দিতে পারে	ডি টি এর অনুরূপ
বিসিজি	১) টিকা দেয়ার ২ সপ্তাহ পরে টিকা দেয়ার জায়গায় লাল রঙ্গের ফোস্কা ২) ২–৩ সপ্তাহ পরে ছোট ঘা	১) কোন ঔষধ বা তেল লাগাবেন না ২) টিকার জায়গা খোলা রাখতে হবে যাতে ঘা শুকাতে পারে

Goto List >

টিকা দান বন্ধ রাখতে হবে বা পিছিয়ে দিতে হবে যদি ঃ–

১) শিশুর অধিক মাত্রায় জ্বর থাকে (১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট এর চেয়ে বেশী);
২) শিশু এত অসুস্থ যে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন ; এবং
৩) আগের ডোজ ডিপিটি নেয়ার পর শিশুর খিচুনি হয়েছিল অথবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল ।

এ ব্যাপারে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহন করা বান্ছনীয়।

টিকা দান শুরুর আগে চিকিৎসককে জানাতে হবে ঃ

১) বাচ্চার জন্মের পর কোন বিশেষ অসুবিধা হয়েছিল কিনা—বিশেষত ঃ জণ্ডিস, শ্বাস কষ্ট ও মেনিনজাইটিস হয়েছে কিনা
২) বাচ্চার খিচুনি হয় কিনা
৩) পরিবারে কারো খিচুনি রোগ আছে কিনা

মনে রাখবেন ঃ এলার্জী, একজিমা, হাপানী ও সাধারন সর্দি কাশি থাকলেও টিকা নেয়া যায়।

অন্যান্য টিকা

হেপাটাইটিস বি টিকা ঃ মারাত্মক জণ্ডিস বা সেরাম হেপাটাইটিস প্রতিরোধকারী টিকা এখন বাংলাদেশে পাওয়া যায়। নিম্ন সময়সূচী অনুযায়ী শিশুকে হেপাটাইটিস বি টিকা দেয়া যেতে পারে এবং এই টিকা নিলে শিশু সেরাম হেপাটাইটিস মুক্ত থাকবে।

প্রথম ডোজ ঃ ডি . পি . টি . তৃতীয় ডোজের একমাস পর
দ্বিতীয় ডোজ ঃ প্রথম ডোজের একমাস পর
তৃতীয় ডোজ ঃ প্রথম ডোজের কমপক্ষে ছয় মাস পর
চতুর্থ ডোজ ঃ প্রথম ডোজের কমপক্ষে পাঁচ বছর পর

মনে রাখবেন ঃ পোলিও টিকা মুখে খাওয়াতে হয় এবং টিকা খাওয়ানোর পর একঘন্টা পর্যন্ত বুকের দুধসহ কোন কিছু খাওয়ানো উচিৎ নয় । ছোট শিশুদের সাধারণত ঃ উরুতে ইনজেকশনের টিকা দেয়া হয় ।

৭. শিশুর খাদ্য

চার থেকে ছয়মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সহায়ক সবধরণের পুষ্টি উপাদান যথেষ্ঠ পরিমানে থাকে।

চার মাস বয়সে অনেক শিশুই শুধু দুধ খেয়ে সন্তুষ্ট হয় না । এছাড়া এসময় থেকে অন্যান্য খাবারে অভ্যস্থ না করালে হঠাৎ করে পাঁচ–ছয়মাস বয়সের পর শিশুর শারীরিক ক্রমবৃদ্ধির চাহিদা মিটানোর জন্য যে বাড়তি পরিপূরক খাবার দরকার হয় তা খাওয়ানো কষ্টকর হয়।

চার মাস বয়সের সময় শিশু সাধারনতঃ চার ঘন্টা পর পর খায় এবং মাঝরাতের পর তার খাবারের প্রয়োজন হয় না । এ সময়ে দুপুরের খাবার খাওয়ানোর সময় নতুন খাবার এক চায়ের চামচের পরিমানে খাওয়ানো শুরু করতে হয় ।

নতুন খাবার খাওয়ানো শুরু করার পদ্ধতি :

ক) দুপুরের খাবারের সময় প্রথমে একটু দুধ খাওয়াতে হবে। তারপর ১ চামচ পরিমানে ফলের রস অথবা পাকা কলা পিষে খেতে দিতে হবে । তারপর আবার দুধ খাওয়াতে হবে ।

খ) ৪ থেকে ৫ দিন পরপর এক একটি নতুন উপকরন চেষ্টা করতে হবে।

গ) এই বয়সে শিশু চিবিয়ে খেতে পারে না , তাকে চুষে খেতে হয় – তাই তাকে নরম খাবার খেতে দিন যাতে সে চুষে খেতে পারে।

সাধারনতঃ পাঁচ মাস বয়সে শিশুদের দাঁত উঠেনা, তাই তাকে সুষম নরম খাবার খেতে দিতে হয়। এই বয়সে শিশু চেটে খাওয়ার মাধ্যমে স্বাদ গ্রহন করে।

এই বয়সে খাবার খাওয়ার সময় থুথু ছিটানোর মতো করে খাবার ফেলে দেয় । অল্প অল্প করে দ্বৈত মিশ্র খাবার যথা সুজি , পায়েশ ও খিচুড়ী খাওয়ানো শুরু করতে হয়। প্রত্যেকদিন খাবার পরিমান এমনভাবে বাড়াতে হবে যাতে অল্প কিছুদিনের মধ্যে একবেলা দুধ খাবার পরিবর্তে এই দ্বৈত মিশ্র খাবার খাওয়ানো হয়। সকাল ১০ টার দিকে এই খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করা ভাল।

ছয়মাস বয়সে নরম ভাতের সাথে ডিমের কুসুম মিশিয়ে খাওয়ানো শুরু করতে হয়। দুপুর বেলায় দুধের বদলে ভাত খাওয়ানোর অভ্যাস করানো ভাল । এছাড়া এই বয়সে দই, স্যুপ , পণির , এবং টমেটো, লেবু, আনারস, কমলা প্রভৃতির রস এবং পাঁকা পেঁপে ও আম বিকাল বেলায় খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হয়। এই বয়সে শিশুর নিজ হাতে খাবার

Goto List >

প্রবনতা দেখা দেয়। তাই তার হাতে কলার টুকরা, রুটির টুকরা বা বিস্কুট দেয়া যেতে পারে।

সাত মাস বয়সে শিং – মাগুর জাতীয় মাছ, বাচ্চা মুরগীর মাংস , মসুরের ডাল, গাঢ় সবুজ শাক, মিষ্টি কুমড়া, আলু ইত্যাদি ভালোভাবে সিদ্ধ করে পিষে নরম ভাতের সাথে শিশুকে খেতে দিতে হয়। অনেক শিশু এ বয়সে পিশপাস ও পালং শাক খেতে পছন্দ করে । এ বয়সে শিশুর হাতে সিদ্ধ গাজর, সিদ্ধ আলু দেয়া যেতে পারে।

আটমাস বয়সে শিশু দুপুর বেলায় শক্ত খাবার এবং বিকাল বেলায় নাস্তা খেতে অভ্যস্থ হয়ে যায় । এই সময়ে খাবার পিষে দেয়া বন্ধ করতে হয়। খাবারের তালিকায় পুডিং সংযোজন করা যেতে পারে। শিশুর হাতে ঝালবিহীন মাংসের টুকরা দেয়া যেতে পারে।

নয়মাস বয়সে তার মাঝে খাবারের ব্যাপারে রুচি বা পছন্দ দেখা দেয়। ফলে অনেক শিশুর খাবারের চাহিদা কমে যায়। তখন নতুন স্বাদ ও উপকরন দিবার চেষ্টা করাও চলে । তবে শিশুকে অবশ্যই দুইবেলা শক্ত খাবার এবং একবেলা নাস্তা খাওয়াতে হবে।

দশমাস বয়সে শিশুকে তিনবেলা শক্ত খাবার খাওয়ানো শুরু করতে হয়। শিশুরা এই বয়সে একেকবারে খেতে সময় নেয় ২০ থেকে ৪৫ মিনিট । এই বয়সে শিশুকে স্বাধীনভাবে খেতে দিতে হয় এবং খাওয়া শেষ করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হয়। কাপে বা বাটিতে করে খাওয়ানো শিখাতে হয়।

একাদশ মাসে শিশু আগে যে সমস্ত খাবার খেতে অপছন্দ করতো তা পুনরায় খাওয়ানোর চেষ্টা করতে হয়। এই বয়সে শিশু তিন বেলা শক্ত খাবার যথা সকাল ১০ টায় সুজি / পায়েশ/ সিরিয়াল, দুপুরে ভাত ও রাতে ভাত খেতে অভ্যস্থ হয়ে যেতে পারে।

শিশুর বয়স একবছর হলে সে সবার সাথে একত্রে খেতে পছন্দ করে । এছাড়া এই বয়সে বড়দের খাবারও সে খেতে পারে। এসময়ে ভালভাবে কাটা ও সিদ্ধ করা মাংস ছাড়াও সিদ্ধ সীম / বরবটি / মটর শুটি জাতীয় খাবার খেতে পারে ।

শিশুর আদর্শ খাবার তালিকা

খাবার	কত মাস বয়সে শুরু করতে হবে	কিভাবে শুরু করতে হবে
ডিমের কুসুম	৪ মাস	১/২ টা আধা সিদ্ধ
দৈ	৪ মাস	১ চামচ
পাকা কলা	৪ মাস	১/২ টা কলা

Goto List >

খাবার	কত মাস বয়সে শুরু করতে হবে	কিভাবে শুরু করতে হবে
সিদ্ধ আলু	৪ মাস	১ ১/২ চামচ চটকানো
নরম ডাল	৪ মাস	১ চামচ
পাকা পেঁপে	৪ মাস	১ চামচ
সুজি	৪ মাস	১ চামচ
মিষ্টি কুমড়া /গাজর	৬ মাস	১ চামচ
নরম ভাত	৬ মাস	৫ চামচ
গাঢ় সবুজ শাক	৭ মাস	১ চামচ
আটার রুটি	৮ মাস	১/ ৪ ছটাক
সিদ্ধ মাছ / মাংস	৯ মাস	১ চামচ
ডিম	৯ মাস	১ /২ টা সিদ্ধ ডিম

• চামচ = এক চায়ের চামচ (৫ মিঃ লিঃ ধারণক্ষম)

Goto List >

৮. শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা

শিশুর খাদ্য পরিকল্পনার সময় নীচের বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রাখতে হয় ঃ

ক) শারীরিক ক্রমবৃদ্ধির সময় পুষ্টি উপাদানের চাহিদা ঃ শিশুদের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য বড়দের তুলনায় দ্বিগুণ ক্যালরী এবং তিনগুণ প্রোটিন সরবরাহ করতে হয়।

শিশুর প্রতিদিনের গড় পুষ্টি চাহিদা

বয়স	কিলো ক্যালরী	প্রোটিন (গ্রাম)
৬–৮ মাস	৯১৫	২০
৯–১১ মাস	১০০০	২০
১ বছর	১১৮০	২১
২ বছর	১৩৬০	২৩
৩ বছর	১৫৬০	২৭
৪ বছর	১৭২০	৩০

খ) পারিবারিক সঙ্গতি ঃ পারিবারিক সঙ্গতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দামের পুষ্টিকর খাবার দিয়ে শিশুর পুষ্টি চাহিদা মিটাতে হয়।

গ) খাদ্যাভ্যাস ঃ পরিবারের খাদ্যাভ্যাসের উপর নির্ভর করে শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা করতে হয়।

ঘ) প্রচলিত কুসংস্কার ঃ প্রয়োজনে প্রচলিত কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে শিশুকে তার সঠিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করতে হবে।

শিশু খাদ্যের উপাদান ঃ

নিম্ন শ্রেণীভুক্ত খাদ্যগুলির বিভিন্ন সমন্বয়ে শিশুর জন্য আদর্শ খাবার তৈরী করা যায়।

ক) শস্য জাতীয় খাদ্য ঃ শক্তির মূল সরবরাহ আসে এজাতীয় খাবার থেকে। চিনি অথবা তেল থেকে প্রাপ্ত কিছুটা শক্তি এর সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রধান শস্য জাতীয় খাদ্য হল চাউল এবং আটা।

Goto List >

খ) ডাল জাতীয় খাদ্য ঃ এই জাতীয় খাদ্য আমিষ বা প্রোটিনের একটি ভাল উৎ সহজে হজমযোগ্য নয় বলে এ জাতীয় খাদ্য ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে সিদ্ধ করে বাচ্চাদের দিতে হয়। মুগ, মসুর ও ছোলা – ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে প্রধান ।

গ) প্রাণীজ আমিষ ঃ দুধ , মাছ, মাংস, ডিম, প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । শিশুর জন্য প্রাণীজ আমিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ঘ) শাক – সব্জী ও ফল ঃ ভিটামিনের জন্য আহারে শাকসব্জী ও ফল গ্রহন প্রয়োজনীয়।

বাড়ন্ত শিশুর জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার দিনে কম পক্ষে ১ বার , শস্য জাতীয় খাদ্য কম পক্ষে ২ বার, আমিষ ও ডাল জাতীয় খাদ্য ২ থেকে ৩ বার এবং শাক সব্জী কমপক্ষে ২ বার ও ফল ১ বার পরিবেশন করা দরকার।

উপরোক্ত চার ধরনের খাবার থেকে দ্বৈত, ত্রৈয় (তিন ধরনের) এবং বহুবিধ মিশ্রনের সাহায্যে শিশুর জন্য পুষ্টিকর, সুষম ও শরীরের চাহিদা মিটাতে সক্ষম খাবার তৈরী করা যায় । তবে মিশ্র খাদ্য নরম ও সহজ পাচ্য করে তৈরী করতে হয় এবং অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

আমিষ ও শক্তি যাতে প্রত্যেক বেলার খাবারে পাওয়া যায় সেদিকে খেয়াল রেখে বিভিন্ন মিশ্রন খাবার তৈরী করা হয়।

ক) দ্বৈত মিশ্রনঃ সাধারনত: শস্য জাতীয় খাদ্যের সাথে ডাল অথবা প্রানীজ আমিষ এরসমন্বয়ে এ খাবার তৈরী করা হয়। শস্য এবং ডালজাতীয় খাদ্যের মিশ্রন ৪ ঃ ১ থেকে শুরু করে ২ ঃ ১অনুপাত পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাড়ানো যেতে পারে।

খ) ত্রৈয় মিশ্রন ঃ দ্বৈত মিশ্রনের খাবারের সাথে সবুজ শাকসব্জির সমন্বয়ে ত্রৈয়–মিশ্রণ খাদ্য তৈরী হতে পারে।

গ) বহুবিধ মিশ্রন ঃ চারধরনের খাবার থেকে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে এ খাবার তৈরী করতে হয়।

তবে প্রতিটি মিশ্রণ খাবার তৈরীর সময় কমপক্ষে ১ চায়ের চামচ তৈল অথবা ঘি দিতে হবে।

৩৫০ কিলো ক্যালরী শক্তি পাওয়া যায় এরকম মিশ্র খাবারের উপাদানের তালিকা ও পরিমাণ দেয়া হলঃ

১) দ্বৈত মিশ্রণ ঃ

ক) চাউল ৬৫ গ্রাম + ডিম ৩০ গ্রাম + তেল ১০ গ্রাম
খ) চাউল ৬৫ গ্রাম + মাংস ২৫ গ্রাম + তেল ১০ গ্রাম

Goto List >

গ) চাউল ৭০ গ্রাম + মাছ ৩০ গ্রাম + তেল ১০ গ্রাম
ঘ) চাউল ৬৫ গ্রাম + ডাল ২৫ গ্রাম + তেল ৫ গ্রাম
ঙ) চাউল ৪৫ গ্রাম + পাউডার দুধ ২৫ গ্রাম + তেল ১০ গ্রাম
চ) চাউল ১০০ গ্রাম + আলু ৩০ গ্রাম + ঘি ৫ গ্রাম (মসলা ও লবন পরিমাণ মত)

২) বহুবিধ মিশ্রণ ঃ

ক) চাউল ৫০ গ্রাম + ডাল ৪০ গ্রাম + মাংস ২০গ্রাম + পিয়াজ ৩০ গ্রাম + তেল ৫ গ্রাম
খ) চাউল ৭৫ গ্রাম + ডাল ৩০ গ্রাম + মাংস ১৫ গ্রাম + পিয়াজ ৫ গ্রাম + ঘি ৫ গ্রাম
গ) চাউল ৫০ গ্রাম + ডাল ৫০ গ্রাম + ডিম ১/২ + ঘি ৫ গ্রাম
ঘ) চাউল ৪০ গ্রাম + ডাল ২৫ গ্রাম + মাংস ১৫ গ্রাম + টমেটো ১০ গ্রাম + সব্জী ১৫ গ্রাম
ঙ) চাউল ৭০ গ্রাম + মাছ ২০ গ্রাম + শাক ৫০ গ্রাম + তেল ১০ গ্রাম
চ) চাউল ৮০ গ্রাম + মাছ ২৫ গ্রাম + সরিষা শাক / শাক ৪০ গ্রাম + তেল ১০ গ্রাম

শিশুর একবেলার খাবারে কমপক্ষে ঃ

ভাত	১ চায়ের কাপ
মাছ/ মাংস	১ টেবিল চামচ (৩ চায়ের চামচ)
সবুজ শাক সব্জী	১/২ চায়ের কাপ
তেল / ঘি	১ চায়ের চামচ

থাকা বান্ছনীয়।

আট – নয় মাস বয়সের শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা ঃ

ঘুম থেকে উঠে	—	মায়ের দুধ
সকাল বেলা	—	ডিম
বেলা ১০ টায়	—	পায়েস / সুজি / হালুয়া
দুপুর বেলা	—	খিচুড়ি + মাছ / মাংস / ডিম + শাকসব্জী
বিকাল বেলা	—	ফল
সন্ধ্যা বেলা	—	ডাল + ভাত + আলু
ঘুমাবার সময়	—	মায়ের দুধ

Goto List >

একবছরের শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা ঃ

ঘুম থেকে উঠে	—	মায়ের দুধ
সকাল বেলা	—	ভাত / রুটি + ডিম
বেলা ১০ টায়	—	সুজি / হালুয়া / পায়েস অথবা ফল
দুপুর বেলা	—	ভাত + ডাল + আলু + মাছ / মাংস / ডিম + শাক – সব্জী
বিকাল বেলা	—	ফল অথবা হাল্কা নাস্তা
রাতের বেলা	—	ভাত +ডাল + আলু + মাছ / মাংস
শোবার সময়	—	মায়ের দুধ

শিশুর দৈনিক খাদ্যের পরিমান (১ থেকে ৫ বছর)

খাদ্য	১–৩ বছর	৪–৫ বছর
১) দুধ / দুগ্ধজাত খাদ্য	৬ ছটাক	৬ ছটাক
২) ডিম	১ টি	১ টি
ক) মাছ / মাংস	১ ছটাক	১ ছটাক
খ) ডাল	১ ছটাক	১ ছটাক
৩) ভাত / রুটি	২ ছটাক	৩ ছটাক
আলু	১/৪ ছটাক	১/২ ছটাক
৪) বাদাম	১/২ ছটাক	৩/৪ ছটাক
৫) ক) ফল	১ ছটাক	১ ছটাক
খ) সবুজ শাক	১/২ ছটাক	৩/৪ ছটাক
গ) সব্জী	১ ছটাক	১ ১/২ ছটাক
৬) চিনি	১/২ ছটাক	৩/৪ ছটাক
৭) ঘি	১/৪ ছটাক	১/ ২ ছটাক

* ১ ছটাক = প্রায় ৬০ গ্রাম

শিশুকে খাওয়ানোর সময় পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ঃ

১) সদ্য প্রস্তুত খাবার পরিবেশন করুন । কাঁচা ও আধা সিদ্ধ খাবার পরিহার করুন।
২) খাবার ঢেকে রাখতে হবে।
৩) ফুটানো পানি পান করতে দিলে ভাল হয়।
৪) সদ্য ধোয়া প্লেট , গ্লাস, কাপ ইত্যাদি ব্যবহার করুন।
৫) নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ প্রতিদিন একই সময়ে শিশুকে খাওয়ানো ভাল।
৬) খাওয়ানোর আগে নিজের হাত ধুয়ে নিতে হবে।

Goto List >

বাসায় আনুমানিক ওজন নিরূপন ঃ

১ চায়ের চামচ	= ৫ মি ঃ লিঃ
১ টেবিল চামচ	= ১৫মিঃ লিঃ
১ পোয়া টিনের কৌটা	= ২৪০ মিঃ লিঃ
৮ আউন্স কাপ	= ২৪০ মিঃ লিঃ
১ সেভেন আপের বোতল	= ২০০ মিঃ লিঃ
১ লিটার	= ১০০০ মিঃ লিঃ বা ১৭ ছটাক

খাদ্য		ওজন (গ্রাম)
চাউল	১পোয়া টিনের কৌটা	২৪০
চাউলের গুড়া	ঝাকিয়ে সমান করে	২০০
আটা	,,	১৫০
ডাল	,,	১৮০
মাছ (টুকরা)	,,	২৪০
মাংস (কুচি কুচি করে কাটা)	,,	২৪০
ডিম – ওমলেট	১ টেবিল চামচ	১০
তেল / ঘি	,,	১৫
চিনি	,,	১৫
মাখন / চর্বি	,,	১৫
পাউডার দুধ	,,	১০

* আঙ্গুল অথবা চাকু দিয়ে টিন অথবা চামচের কিনারার সমান করে নিতে হবে।

Goto List >

৯. সাধারণ রোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশুর অনেক সাধারণ সমস্যা আছে যার সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা না থাকলে মায়েরা অসহায় বোধ করেন। নিম্নে বর্ণিত রোগ সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা থাকলে অহেতুক বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১) **জ্বর ঃ** দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট। যদি দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তাহলে জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করতে হবেঃ

ক) গায়ের সমস্ত কাপড় খুলে ফেলে পাতলা চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে দিন;
খ) ঈষদুষ্ণ বা কুসুম গরম পানি দিয়ে শরীর মুছে দিন ;
গ) প্রচুর তরল খাদ্য ও পানীয় খেতে দিন ;
ঘ) জ্বর ১০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশী হলে জ্বর কমানোর ঔষধ প্যারাসিটামল খাওয়ান; এবং
ঙ) শিশুর জ্বর চার ঘন্টা পর পর মাপুন এবং তা চার্ট করে লিখে রাখুন। জ্বর কমানোর ঔষধ খাওয়ালে তাও চার্টে উল্লেখ করুন।

২) **জ্বর জনিত খিচুনি ঃ** সাধারণত ঃ ছয়মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সে অনেক শিশুর জ্বর হলে সাথে খিচুনি দেখা দেয়। জ্বর জনিত খিচুনি দেখা দিলে ঃ

ক) মেঝেতে অথবা তোষকে কাত করে শোয়াতে হবে ;
খ) গায়ের কাপড় সব ঢিলা করে দিতে হবে অর্থাৎ বোতাম খুলে ও ফিতা ঢিলা করে দিতে হবে;
গ) দাঁতে যাতে খিল না লাগে তার জন্য চায়ের চামচে কাপড় পেচিয়ে দুই পাটি দাঁতের মধ্যে ঢোকাতে হবে ; এবং
ঘ) জ্বর কমানোর জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

জ্বর ছাড়া খিচুনি হলে, খিচুনি ১৫ মিনিটের বেশী স্থায়ী হলে, ২৪ ঘন্টায় একের অধিকবার খিচুনি হলে অথবা শরীরের একদিকে খিচুনি হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।

৩) **সর্দি ঃ** নাক দিয়ে পানি পড়া, হাঁচি ও অল্প জ্বর এ রোগের প্রধান লক্ষণ। যদি নাক বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শিশুর খাওয়া এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। সর্দি জ্বরে সম্ভব হলে শিশুর বিছানার মাথার দিকটা উঁচু করে দিন। বন্ধ নাকের জন্য নাকে দেয়ার ফোঁটা ঔষধ ব্যবহার করুন। উপরের ঠোঁটে ক্রিম মেখে রাখতে হয় যাতে সর্দি ঝরে ঘা হতে না পারে। তরল খাদ্য ও প্রচুর পাণীয় খাওয়ালে ভাল হয়। সর্দিতে আক্রান্ত শিশুকে আরামদায়ক পরিবেশে রাখতে হয় ; নাক পরিস্কার রাখতে হয় এবং জ্বরের প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয়।

Goto List >

সর্দির সাথে যদি শিশুর উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর দেখা দেয় এবং ভারী ও দ্রুত নিশ্বাস নিতে থাকে তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রয়োজন।

৪) কাশি ঃ শিশুর যে কারণেই কাশি হোক না কেন তার জন্য প্রাথমিক পরিচর্যাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ। কাশির প্রাথমিক পরিচর্যা—

ক) প্রচুর তরল খাদ্য ও পানীয় খাওয়াতে হবে ;

খ) সহনীয় গরম পানি খাওয়াতে হবে এবংদিনে কয়েক বার জলীয় বাস্প (Steam) নাক দিয়ে টেনে নিতে হবে ; এবং

গ) ঈষদুষ্ণ বা কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস ও কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ানো যায়।

যদি কাশির সাথে — ১) দ্রুত নিশ্বাস (মিনিটে ৫০ বার বা তার চেয়ে বেশী) ; ২) বুকের পাজর ভিতরে ঢুকে যায় ; ৩) নীল হয়ে যায়; বা ৪) টান থাকে তাহলে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

৫) ডায়ারিয়া ঃ পায়খানা লক্ষ্যণীয়ভাবে নরম বা তরল হলে এবং শিশুর মলত্যাগের স্বাভাবিক অভ্যাসের চেয়ে বেশী মলত্যাগ করলে পানি শূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন দেখা দেয়। এই পানি শূন্যতা রোধ করার জন্য খাবার সেলাইন খাওয়াতে হয়।

ডায়ারিয়া হলে হঠাৎ করে শিশুর ওজন কমে যায়, পানির পিপাসা পায়, খুব দুর্বল হয়ে যায়, খিটখিটে মেজাজ হয়, চোখ কোটরে ঢুকে যায়, জিহ্বা শুকিয়ে যায়, মাথার চাঁদি বা তালু ডেবে যায় এবং চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়– ফলে চামড়া টেনে ছেড়ে দিলে আস্তে আস্তে সমান হয় অথবা অনেকক্ষণ চামড়ায় ভাজ থাকে। কয়েক ঘন্টা যদি শিশুর পেশাব করা বন্ধ থাকে তাহলে বুঝতে হবে শিশু মারাত্মক পানি শূন্যতায় ভুগছে।

ডায়ারিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

ডায়ারিয়ার জন্য সৃষ্ট পানি শূন্যতা রোধ করাই হল ডায়ারিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসা।

ক) বাজারে এক লিটার বা আধা লিটার খাবার সেলাইন তৈরী করার জন্য লবনজলের সরবতের প্যাকেট পাওয়া যায়। প্যাকেটে মুদ্রিত নির্দেশ অনুযায়ী সেলাইন প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করুন।

খ) **চিনি/গুড়ের সেলাইন ঃ** ৮ চায়ের চামচ চিনি/গুড় ; ১ চায়ের চামচ লবন ও ১ লিটার পানি দিয়ে বাসায় এ সেলাইন তৈরী করা হয়।

গ) **চাউলের সেলাইন ঃ** ৮ চায়ের চামচ চাউলের গুড়া ১ লিটারের চেয়ে সামান্য বেশী পানিতে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হয়। তারপর চুলার উপর রেখে গরম করতে

Goto List >

হয় এবং চামচ দিয়ে নাড়তে হয়। ৫ থেকে ৭ মিনিট ফুটানোর পর চুলা থেকে নামিয়ে ১চায়ের চামচ লবন মিশাতে হয়। ঠান্ডা হলে পরে খেতে দিতে হয়।

যদি চাউলের গুড়া না থাকে তাহলে দুই মুঠ চাউল ভালোভাবে ধুয়ে পিষে নিতে হয়। তারপর ১ লিটার এর চেয়ে সামান্য বেশী পানিতে পিষানো চাউল মিশাতে হয় এবং চাউলের গুড়ার সেলাইনের মতো একই পদ্ধতিতে সেলাইন তৈরী করতে হয়।

* এক চায়ের চামচ. ৫ মি:লি: তরল ধারণক্ষম এবং লবন/চিনি মাপার সময় চামচের কিনারার সমান করে চাকু অথবা আঙুল দিয়ে সমতল করে নিতে হয়। একপোয়া কাঁচের পানির গ্লাস ২৪০ মি:লি: পানি ধারন করে তাই সাড়ে চার গ্লাস পানি ১ লিটারের চেয়ে সামান্য বেশী। ১ লিটার সমান ১০০০ মি: লি: বা ১৭ ছটাক। এছাড়া একটি সেভেন আপ এর বোতল ২০০ মি: লি: ধারণ করে।

মনে রাখবেন ঃ কখনও খাবার সেলাইন চোখের পানির চেয়ে বেশী লবণাক্ত হবেনা।

সেলাইন খাওয়ানোর পদ্ধতি ঃ ২ থেকে ৩ মিনিট পর পর অল্প অল্প করে সেলাইন চামচ অথবা কাপে করে খাওয়াতে হয়। শিশু যদি একবারে বেশী খেতে চায় তাহলে বেশীই খেতে দিতে হয় — এতে ক্ষতি হয় না।

প্রতিবার পাতলা পায়খানা করার পর ১০০ মি: লি: বা আধা চায়ের কাপ সেলাইন খেতে দিন। বেশী খেতে চাইলে বেশী খেতে দিতে হবে।

যদি বাচ্চা বমি করে তবে প্রতি তিন মিনিট পর পর ২ চায়ের চামচ করে সেলাইন খাওয়াতে থাকুন। সাধারণতঃ সেলাইন খাওয়ানো শুরু করার এক থেকে দু ঘন্টার মধ্যে বমি করা বন্ধ হয়ে যায়।

শিশুর বয়স ৯ মাসের কম হলে খাবার সেলাইন ব্যবহারের সাথে সাথে বুকের দুধ অবশ্যই খাওয়াতে হবে। যদি শিশু বুকের দুধ না খায় তবে খাবার সেলাইন খাওয়ানোর পরপরই দ্বিগুণ পরিমান ফুটানো ঠাণ্ডা পানি খেতে দিন।

ডায়ারিয়া চলাকালীন শিশুর খাবার ঃ

ডায়ারিয়া চলাকালীন শিশুকে স্বাভাবিক খাবার খেতে দিতে হয়, তবে শাক এবং আঁশযুক্ত খাবার না খাওয়ানোই ভালো।

মায়ের দুধ, পাতলা গরুর বা টিনের দুধ, নরম ভাত, সুজি, চিড়া, আলু, দই, কলা, পেঁপে, আনারস, ডাবেরপানি, ফলের রস ও অন্যান্য নরম ও সহজে হজম হয় এমন খাবার খেতে দিতে হয়।

কখন চিকিৎসকের নিকট বা হাসপাতালে নিবেন ঃ

ক) সেলাইন খাওয়ানো শুরু করার ৪ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে যদি পেশাবের মাত্রা স্বাভাবিক না হয় অথবা পানি শূন্যতা না সারে ;

খ) সেলাইন খাওয়ানো শুরু করার দু ঘন্টা পরও যদি শিশু ঘন্টায় চারবারের চেয়েও বেশী বমি করে;

Goto List >

গ) স্যালাইন খাওয়ানোর পরও যদি পেট ফেঁপে উঠে অথবা খিচুনী হয় অথবা শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়।

৬) আমাশয়: শিশুদের সাধারনত: রক্ত আমাশয় বা ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি হয় । যদি শিশুর জ্বর ১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট হয় এবং পায়খানার সাথে রক্ত যায় তাহলে তার চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন। সেজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৭) **চর্মরোগ:** শিশুদের সাধারনত : খোঁস-পাঁচড়া (Scabies), সংক্রামক ক্ষত বা ইম্পেটাইগো এবং দাদ এ আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তন্মধ্যে খোঁস –পাঁচড়া বা খুজলী অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ এবং এ রোগে একটি শিশু আক্রান্ত হলে পরিবারের সবাই এমনকি তার বন্ধু বান্ধব সবাই আক্রান্ত হতে পারে। তাই খুজলী বা যে কোন চর্মরোগের আশু চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

সংক্রামক চর্মরোগ থেকে বেঁচে থাকতে হলে:

১) নিয়মিত পরিস্কার ও নিরাপদ পানিতে গোসল করতে হবে;
২) একজনের কাপড় আরেকজন ব্যবহার করতে পারবেনা ;
৩) কাপড়-চোপড়, বিছানার চাদর, বালিশের কভার প্রভৃতি সব সময় পরিস্কার রাখতে হবে;এবং
৪) আক্রান্ত শিশুকে সত্বর চিকিৎসা করাতে হবে এবং চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে তাকে আলাদা করে রাখতে হবে।

Goto List >

১০. কখন ডাক্তার দেখাতে হবে

স্বাভাবিক নবজাতকের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণ সমূহের যে কোন একটি বা একাধিক লক্ষণ যদি দেখা দেয় তা হলে ডাক্তার দেখাতে হবে –
১) শ্বাস কষ্ট ; ২)অস্বাভাবিক রকমের দুধ খেতে অনীহা ; ৩) বমি অথবা পাতলা পায়খানা ; ৪) শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের (৯৮ ৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট) চেয়ে বেশী অথবা কম (৯৭ডিগ্রী ফারেনহাইটের চেয়ে কম) ; ৫) পেট ফাঁপা ; ৬) জন্ডিস ; ৭) শিশু অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কিংবা খিচুনি হওয়া ; এবং ৮) গায়ের রং নীল বর্ণ ধারণ করা।

শৈশব কালের সাধারণ রোগ ব্যধিতে যদি নিম্ন বর্ণিত সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তাকে অবশ্যই ডাক্তার দেখাতে হবে অথবা প্রয়োজনে সরাসরি হাসপাতালে নিতে হবে—

১) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা খিচুনি হওয়া ;
২) সাধারন কোন কারন ছাড়া অতিরিক্ত কান্না ;
৩) ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া ;
৪) জ্বর সহ মাথার চাঁদি ফুলে যাওয়া ;
৫) শ্বাস কষ্ট – ক) মিনিটে ৫০ বার বা তার চেয়ে বেশী নিশ্বাস নেয়া, খ) শ্বাস নেয়ার সময় পাজর ভিতরে ঢুকে যাওয়া, গ) নীল হয়ে যাওয়া ; বা ঘ) টান হওয়া ;
৬) আধা ঘন্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় ধরে বমি করা ;
৭) গলা ব্যথা বা গলা বসে যাওয়া ;
৮) চামড়ায় র‍্যাস বা লালচে ফুস্কুরী উঠা ;
৯) পেটে অসহনীয় ব্যথা ;
১০) কোকা কোলার রঙের মত পেশাব বা পেশাবে রক্ত ;
১১) নতুন করে রাতে বিছানায় পেশাব করা শুরু ;
১২) অল্প অল্প করে সারা দিন পেশাব হওয়া ; এবং
১৩) ডায়ারিয়া/বমির পর –ক) পেশাবের পরিমান কমে যাওয়া বা সরিষার তেলের মত ঘন রঙ হওয়া ; খ) ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পেশাব বন্ধ হয়ে থাকা ; গ) মাথার চাঁদি ডেবে যাওয়া ; ঘ) খিচুনি হওয়া ; বা ঙ) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

এছাড়া শিশুর স্নায়বিক পরিপুষ্টিতে যদি কোন অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় অর্থৎ যে বয়সে শিশুর যা করা স্বাভাবিক তা যদি না করে , যেমন – ৬ সপ্তাহ বয়সে আওয়াজ শুনলে চমকে না উঠে, ৩–৪ মাস বয়সে চোখ ও মাথা ঘুরিয়ে কোন কিছু অনুসরন না করে, ৮ মাস বয়সে বসতে না পারে বা ১২ মাস বয়সে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন ।

Goto List >

১১. পরিশিষ্ট

ক. শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি

নিয়মিত শিশুর চোখ, মুখ, কান, নাক ও নখের যত্ন নিতে হয়। একটু বড় হলে শিশুকে ধীরে ধীরে এসব ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজ হাতে এ সমস্ত কাজ করানো প্রয়োজন।

প্রতিদিন চোখ, নাক, মুখ ও চামড়া পরিস্কার করতে হয়। এছাড়া মাঝে মাঝে নখ কেটে ছোট করতে হয়।

চোখঃ ভেজা নরম কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে চোখের পাতা পরিস্কার করে দিতে হয়।

নাকঃ নাক সব সময় পরিস্কার রাখতে হয়। মুখ মোছার নরম কাপড় বা তোয়ালের কোনাটা ভিজিয়ে আস্তে আস্তে নাকের শুকনো শ্লেষ্মা মুছে দিতে হয়। নাকের ভিতর কাপড়ের কোনা বা কাঠিতে তুলা লাগিয়ে পরিস্কার করা ঠিক নয়।

মুখঃ সাধারণত : মুখের জন্য অতিরিক্ত পরিচর্যার প্রয়োজন পড়ে না। তবে শিশুর সামনের দিকের চারটি দাঁত উঠলে পরে দাঁত মাজা শুরু করতে হবে।দুই বছর বয়সে শিশু প্রতিদিন নিজেই নিজের দাঁত মাজতে পারে। এছাড়া শিশু একটু বড় হলে খাবার খাওয়ার পর পানি দিয়ে কুলকুচা বা কুলি করানো শিখাতে হয়।

গোসল ঃ প্রতিদিন একবার গোসল করাতে পারলে ভাল হয়। মাঝে মাঝে সাবান ও স্যাম্পু ব্যবহার করা যায়। প্রতিবার গোসলের সময় চোখ ও কান পরিস্কার করতে হয়। খেয়াল রাখুন যাতে কানে পানি না যায়।

কানঃ কানের বাইরের দিক এবং কানের ছিদ্রের প্রবেশ মুখ পরিস্কার করলেই চলে। কানের ছিদ্রের ভিতর পরিস্কার করতে যাওয়া উচিৎ নয় এতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

নখঃ বাচ্চার নখ কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হয় এবং নখ সব সময় ছোট রাখতে হয়। প্রথম বছরে নখ ৪–৫ দিন পর পর কাটতে হয় যাতে শিশুর নিজের নখের আঘাতে মুখের এবং শরীরের চামড়া কেটে না যায়। শিশু যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনই হলো নখ কাটার উপযুক্ত সময়।

Goto List >

খ. প্রায়োগিক দিক

ক) **থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপার নিয়ম ঃ** ৬ বছরের কম বয়সের শিশুদের তাপমাত্রা বগল তলায় থার্মোমিটার রেখে মাপতে হয়। প্রথমে ঝাকিয়ে থার্মোমিটারের পারদ নীচে নামিয়ে নিন, তারপর বগল তলায় থার্মোমিটার ঢুকিয়ে বগল ৩ মিনিট চেপে রাখুন। তারপর তাপমাত্রা লক্ষ্য করুন। বগল তলার তাপমাত্রা মুখের ভিতরের তাপমাত্রা থেকে ১ ডিগ্রী ফারেনহাইট কম হয়।

খ) **জলীয় বাষ্প দিয়ে শিশুর শ্বাসনালী এবং গলার ভিতরে সেক দিবার সহজ পদ্ধতি ঃ** কেতলীতে পানি সিদ্ধ করুণ। পানি যখন বাষ্প হয়ে কেতলীর নল দিয়ে বের হওয়া শুরু হবে তখন শিশুকে কোলে নিয়ে কেতলীর নলের কাছাকাছি বসুন যাতে শিশু শ্বাস নিবার সময় জলীয় বাষ্প নাক দিয়ে ঢুকে। লক্ষ্য রাখবেন : শিশুর গায়ে যেন গরম কেতলী না লাগে এবং চুলা যেন নিভান থাকে।

গ) **স্পঞ্জ করা ঃ** কাপড় বা তোয়ালে ঈষদুষ্ণ পানিতে ভিজিয়ে গা মুছে সাথে সাথে শুকনো কাপড় দিয়ে গা শুকিয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজন বোধে বাতাস করুন কিংবা পাখা চালিয়ে রাখুন। শরীরের এক অংশ ঢেকে রেখে অন্য অংশ স্পঞ্জ করুন।

ঘ) **জ্বরের ঔষধ খাওয়ানো ঃ** জ্বর সাধারণত : ১০১ ডিগ্রী ফারেনহাইট হলে জ্বরের ঔষধ প্যারাসিটামল প্রয়োগ করা হয়। প্যারাসিটামল সিরাপ প্রতি চামচে ১২০ মিলিগ্রাম থাকে। প্যারাসিটামল সিরাপ সাধারনত :–

১ বছরের চেয়ে কম বয়সের শিশুদের প্রতিবার ১/২ চামচ ;
১ থেকে ৩ বছরের শিশুদের প্রতিবার ১/২ থেকে ১ চামচ ; এবং
৩ থেকে ৬ বছরের শিশুদের প্রতিবার ১ থেকে ২ চামচ দিতে হয়।

তবে প্রতি কিলোগ্রাম শিশুর ওজনের জন্য দৈনিক ২৫ মিলি গ্রাম হল প্যারাসিটামল এর মাত্রা যা ৪ থেকে ৬ ভাগে বিভক্ত করে সারাদিনে দিতে হয়।

Goto List >

গ. স্মরনীয়

* সকল ঔষধ শিশুর নাগালের বাইরে রাখুন
* যে কোন ঔষধ নির্দেশিত মাত্রার চেয়ে বেশী ব্যবহার করলে বিষের মত কাজ করে।
* ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন এর নির্দেশ অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় ঔষধ বর্ণিত সময়ে খাওয়াতে হবে।
* ডাক্তার যতদিন ঔষধ ব্যবহার করতে বলেছেন – ততদিন ঐ ঔষধ ব্যবহার করুন।
* কখনও ঔষধ ব্যবহার করার ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত নিবেন না – ঔষধ খাওয়ানোর মাঝপথে ঔষধ বন্ধ করবেন না।
* ডাক্তারের সাথে পরামর্শ না করে একই রকম অসুখে আগের দেয়া প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী পুনরায় ঔষধ খাওয়াবেন না।

ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্ত শিশুকে আলাদা রাখার মেয়াদ :

হাম ঃ র‍্যাস বের হওয়ার দিন থেকে ৭ দিন

মাম্পস ঃ গাল ফোলার দিন থেকে ১০ দিন

জন্ডিস ঃ জন্ডিস দেখা দেয়ার দিন থেকে কমপক্ষে ১৪ দিন

জল বসন্ত ঃ বসন্তের দানা দেখা দেয়ার পর থেকে ২১ দিন

Goto List >

ঘ. সহায়ক গ্রন্থ ও সাময়িকী

১) Cameron M and Hofvander Y. Manual on Feeding Infant and Young Children. 2nd Ed. 1976 : Protein Calorie Advisory Group of United Nations System.

২) Children in the Tropics. No 12 ; 1979 : International Children's Centre, Paris.

৩) Dialogue on Diarrhoea, (Issue 1 - 28) : AHRTAG, London.

৪) ARI News (Issue 1 -8), AHRTAG, London.

৫) Valman HB. ABC of 1 to 7. 1982 : BMJ, London.

৬) General Practitioner. (Issue of 12-10-1984) : Hay Market Publication, London.

৭) Sikder ZU, Zubayer M. Management of Acute Diarrhoeas in Young Children. 1984: Dhaka.

৮) ডায়ারিয়ার সহজ চিকিৎসাও প্রতিরোধ ব্যবস্থা। ১৯৮০ : আই সি ডি ডি আর বি, ঢাকা।

৯) সিদ্দিকা কবীর । রান্না খাদ্য-পুষ্টি। ৩য় সংস্করণ ১৯৮০: বুলা পাবলিকেশনস, ঢাকা।

১০) পুষ্টি বার্তা (সংকলন)। ১৯৮০ : পুষ্টি খাদ্য বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়, ঢাকা।

১১) Hutchison JH. Practical Paediatric Problems. 5th ed, 1980, LLoyd-Luke Ltd, London.

১২) Illingworth. Basic Developmental Screening : 0 - 4 years. 3rd ed, 1982, Black well Scientific Publications, London.

১৩) সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী

Goto List >

পাঠকদের প্রতিঃ

বইটির বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে বাধিত হবো। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

এই পুস্তিকায় শিশুর জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু প্রতিপালনে মায়েরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হন তার সংক্ষিপ্ত অথচ বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবমুখী সমাধান রয়েছে। এ পুস্তিকায় যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ঃ ১. পরিচর্যার শুরু, ২. নবজাতকের পরিচর্যা, ৩. শিশু পরিচর্যার সাধারণ বিষয়, ৪. শিশুর দৈহিক ও স্নায়বিক পরিপুষ্টি, ৫. শিশুর আবেগজনিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা, ৬. টিকা, ৭. শিশুর খাদ্য, ৮. শিশুর খাদ্য পরিকল্পনা, ৯. সাধারণ রোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা, ১০. কখন ডাক্তার দেখাতে হবে।